Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501065 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

Tagore's Thought and Creation of Music in the Education System
রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ভাবনায় ও নির্মাণে সংগীত

Dr. Manini Mukhopadhyay
Santiniketan
Birbhum

Received on: 24th May 2026
Accepted on: 07th June 2026

Abstract:
Rabindranath Tagore's path of spiritual practice was rooted in the ancient Brahmavadi and Gurukul traditions of musical devotion. He sought liberation through music and also inspired others to attain freedom through it.

In Rabindranath's thoughts and creations, music occupied the highest place. He deeply believed that the education system he envisioned should be holistic, where music and fine arts would stand alongside all other branches of learning with equal importance.

The importance of music in human life is immense. To establish fine arts as an integral part of education, Rabindranath founded the Brahmacharyashram and Brahmavidyalaya, where music and fine arts were given a place of high honour. His contribution to introducing music into the education system is unparalleled. He understood the necessity of arts and aesthetics for achieving complete education.

Today, music and fine arts have found an important place in modern education, and students are actively pursuing research in these fields. The present education system emphasizes skill development, a concept that Rabindranath had already established more than a hundred years ago.

Key Words:
The ancient Brahmavadi Gurukul, the resonance of the Infinite, restraint in art, holistic education, the fine arts, the child's mind, and joy

মূল প্রবন্ধ

"সমস্ত মানবজীবন অনন্তের রাগিনীতে বাধা একটি সংগীত ছাড়া কিছুই নয়।" একথা একেবারে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই বিশ্বাসের, এই পথের, ধারার শ্রেষ্ঠ সাধক হলেন রবীন্দ্রনাথ এবং এই ধারাটি আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে অর্থাৎ বেদ-উপনিষদের যুগ থেকেই প্রবাহিত। এই বিশ্বসংগীত, বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে অনন্তের সুরটিকে বেঁধে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সাধনার পথ হলো প্রাচীন ব্রহ্মবাদী, গুরুকুলের সংগীত সাধকের পথ; তাঁদের মতো তিনিও সংগীতেই মুক্তি খুঁজেছেন, মুক্তি দিয়েছেন।

একটা বিষয় খুব স্পষ্ট যে, রবীন্দ্র চিন্তনে ও সৃষ্টিতে সংগীতের স্থান সব থেকে উচ্চে। নিজেকে সংগীত রচয়িতা, সুরকার, সংগীত স্রষ্টা হিসাবে প্রচার করার কোনো পূর্ব অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। যা হয়েছে, তা স্বতঃস্ফূর্ত, বিধাতার দান। নতুন কিছু করতে

© Santiniketan Sahityapath

হবে এমন কোনো বাইরের তাগিদ তাঁকে সংগীত রচয়িতা করে তোলেনি। কেবলমাত্র সংগীতের অন্তর্নিহিত প্রেরণা, অন্তরের আনন্দ কবিকে এই সৃষ্টিতে উৎসাহিত করে তোলে। তিনি বলেছেন — "গান লিখতে যেমন আমার নিবিড় আনন্দ হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। এমন নেশায় ধরে যে, তখন গুরুতর কাজের গুরুত্ব একেবারে চলে যায়...।" আবার বলেছেন — "গানের সুরের আলোয় এতক্ষণে সত্যকে দেখলুম। অন্তরে সর্বদা এই গানের দৃষ্টি থাকে না বলেই সত্য তুচ্ছ হয়ে সরে যায়।... সুরের বাহন সেই পর্দার আড়ালে সত্য লোকে আমাদের নিয়ে যায়, সেখানে পায়ে হেঁটে যাওয়া যায় না...।" যে-কোনো শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রেই 'সংযম' বস্তুটি অত্যন্ত জরুরি। সংযমের ফলে শিল্পী এবং শিল্প যেমন যথার্থ হয়ে উঠতে পারে, সংযমহীনতা তেমনি শিল্পকে নষ্ট করে ফেলতে পারে।

রবীন্দ্র চিন্তনে সংগীত কী?— তার উত্তরে কবি বলেছেন — "আমাদের দুই রকমের খাদ্য আছে-একটি প্রয়োজনের, আর-একটি অপ্রয়োজনের; একটি অন্ন, আরে একটি অমৃত। অন্নের ক্ষুধায় আমরা মর্তলোকের সকল জীবজন্তুর সমান, অমৃতের ক্ষুধায় আমরা সুরলোকে দেবতাদের দলে। সংগীত হচ্ছে অমৃতের নানা ধারার একটি।... " অর্থাৎ যে ব্যক্তি কেবলমাত্র বল প্রয়োগে নিজেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করে, নিজের ক্ষুধা মেটানোর চেষ্টা করে সেটাতে কোনো নান্দনিকতা, সৌন্দর্য নেই; আছে 'পালোয়ানি'। শক্তির সত্য রূপ হচ্ছে সৌন্দর্য। গাছ নিজেকে মেলে ধরে ফুলে-ফলে, বর্ণে-গন্ধে — এখানেই তার সত্যতা, প্রকাশ। কারণ ওই ফুলের পরেই আসবে ফল যা ভাবীকালের প্রজন্মকে, অরণ্যকে ধারণ করে আছে। তার পূর্ণ শক্তি প্রকাশ পায় ফুলে। এখানেই তার অমরতা। ঠিক একইভাবে সাহিত্যে, সংগীতে, সর্বপ্রকার কলা বিদ্যায় প্রাণশক্তি অমরতাকে প্রকাশ করে। উপনিষদেও বলা হয়েছে জন্মালেই সকলে অমর হয় না, অমর সেই হয়, যে অসীমকে উপলব্ধি করে, "অমৃতাস্তে ভবন্তি" সংগীতেও সেই অসীমেরই ব্যঞ্জনা রসোপলব্ধি।

মানবজীবনে সংগীতের প্রয়োজনকে বিশেষভাবে প্রয়োজন — এটি অনুভব করে তৎকালীন শিক্ষাবিদ ও শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েই রবীন্দ্রনাথ বললেন — "শিক্ষার এইরূপ সংকীর্ণতার মধ্যে আমাদের জীবন ক্রমে বিকলাঙ্গ হয়ে পড়েছে। অতঃপর একে প্রশ্রয় দেওয়া কোনোমতেই আর উচিত হবে না।... "এরই ফলস্বরূপ তৈরি হলো নতুন শিক্ষাকেন্দ্র শান্তিনিকেতনের ব্রহ্ম-বিদ্যালয়, পরবর্তীতে 'বিশ্বভারতী'; যেখানে সংগীত ও ললিতকলাকে সম্মানের আসন, উচ্চাসন দেওয়া হয়।

পরবর্তীকালে শিক্ষা ব্যবস্থায় সংগীতকে স্থান দেওয়ার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা অপরিসীম। আমরা জানি ছেলেবেলায় তাঁর বিদ্যালয়ের জীবন সুখকর ছিল না। এক নিরানন্দ আবহাওয়ায় বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন তাঁকে মর্মাহত করেছিল। পরিণত বয়সে তিনি খুঁজে পেলেন শিক্ষাদানের নতুন পথ; প্রাচীন ভারতের তপোবনের শিক্ষার আদর্শকেই গ্রহণ করলেন কারণ তপোবনের শিক্ষায় যেমন আছে গুরুগৃহ বাসকালে শুদ্ধতম, উচ্চতম শিক্ষা ও সংস্কৃতি; অন্যদিকে আছে অরণ্য বাসকালে উন্মুক্ত, অখণ্ড বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হওয়া। বিরাট ও বিচিত্র আনন্দের উৎস এই বিশ্ব প্রকৃতি, যে কিনা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাদের দেহ-মনকে গড়ে তুলবে; প্রবল শক্তি জোগাবে অন্তরে। যখনই প্রকৃতির সঙ্গে মানব আত্মার মিলন ঘটবে, তখনই কথায়-সুরে-রেখায়-রঙে, বর্ণে-ছন্দে মানুষ নিজেকে প্রকাশ করবে, আনন্দের স্বাক্ষর রেখে যাবে।

শিক্ষার এই মূল সত্যটিকে অর্থাৎ আনন্দকে শিক্ষা পদ্ধতি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। — এ মন্তব্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের। তাই আনন্দের ডাক দিয়েই কেবলমাত্র নিজের পরিবারের জন্য নয়, সর্বসাধারণের জন্য গড়ে তুললেন শিক্ষা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান শান্তিনিকেতন আশ্রমের বিদ্যালয়টিকে যা আজ বিশাল মহীরূহ 'বিশ্বভারতী'; যেখানে বিশ্ব, ভারত এবং ভারতী একাকার। এখানে শিক্ষার সংকীর্ণ সীমাকে অতিক্রম করে সাধারণ পঠন-পাঠনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য নাড়ীর বাঁধনে বাঁধলেন সংগীত, নৃত্য, বাদ্য, নাটক, কারুকার্য ও লোকহিতকর শিক্ষা-ব্যবস্থাকে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই বিশ্বাসের, শিক্ষার পূর্ণ মুক্তি। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পূর্ণতর মানুষ রূপে গড়ে উঠুক। প্রথম থেকেই তিনি সামগ্রিক শিক্ষার (Holistic Education) কথাই বলেছেন। এই শিক্ষা শিশুমনকে আনন্দদানের সঙ্গে সঙ্গে দেহ-মনকে সুস্থতা দান করবে। পরিপূর্ণ শিক্ষার ক্ষেত্রে নানা প্রকার কলা বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন। সংগীত কেবলমাত্র শিল্পী তৈরি করবে এমন নয়; শিশু মনকে, দেহকে, মস্তিষ্কের যান্ত্রিকতাকে সুস্থতা দান করবে।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় যে কাঠিন্য, অমানবিক চাপ, তার থেকে যেসব কঠিন ব্যাধি সেগুলি থেকে মনকে সরিয়ে শুদ্ধ করার

জন্য, মানসিক উদ্বেগ কমানোর জন্য জন্ম নিয়েছে Music Therapy। রবীন্দ্রনাথ তাঁর যুগে এই Therapy সৃষ্টি করে দিয়ে গেছেন তার গানে, নাটকে, নৃত্য, ছবি আঁকায়। বিদ্যালয়ে শিশুদের গোড়া থেকেই প্রতিদিনের পঠন-পাঠনের এক অচ্ছেদ্য অঙ্গ এই সংগীত। শুধু তাই নয় যে শিশুটি যে বিষয়ে উৎসাহী এবং উপযুক্ত, তাকে সেই বিষয়ে যেন বেশি দৃষ্টি দেওয়া হয়, সেটিও ছিল তাঁর শিক্ষাদানের আদর্শ। এতে করে শৈশব থেকে শিশুটি যেমন শিক্ষা গ্রহণে আনন্দে মেতে উঠবে, অন্তর থেকে শিক্ষাকে গ্রহণ করবে, তেমনি পরিণত বয়সে এই শিক্ষাই জীবিকার পথ দেখাবে। কত সুদূর প্রসারী দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তায় — একবার ভেবে দেখবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা পদ্ধতির মূলে অর্থাৎ রবীন্দ্রমানসিকতায় শিক্ষার বীজ রোপিত হয় শিশুদের মনে আনন্দের মধ্যে দিয়ে। অর্থাৎ তাঁর শিক্ষাধারার প্রথম শিষ্য হলো শিশু; কারণ এই বীজের মধ্যে অঙ্কুরোদগম ঘটবে এবং ভবিষ্যতে শিশুরাই রবীন্দ্র শিক্ষার পরিপূর্ণ আদর্শকে বৃক্ষে পরিণত করবে। তাই খেলার ছলে শিশুদের শিক্ষাদান প্রয়োজন, শৃঙ্খলায় শৃঙ্খলিত করে নয়। শিশু মনে তাঁর শিক্ষার, শিশুর আত্মপ্রকাশের বাহন তিন শক্তি — ভাষা, সুর ও ছন্দ এবং রঙ ও রেখা। সাহিত্য, সংগীত ও চিত্রকলা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার প্রধান স্তম্ভ। কেবলমাত্র শান্তিনিকেতন আশ্রম নয়, বিশ্বের কাছে তিনি একটি সামগ্রিক শিক্ষার ছবি আঁকতে চেয়েছেন। যে-হকোনো শিক্ষা যেন কোনো কঠিন শৃঙ্খলায় আবদ্ধ না থাকে, কারাগৃহের শিক্ষা যেন না হয়; তার মধ্যে যেন আনন্দ থাকে। আর এই আনন্দই শিক্ষার্থীকে সুষম বিকাশে পরিপূর্ণ করে গড়ে তুলবে। এই গড়ে তোলার, হয়ে ওঠার কথা রবীন্দ্রনাথ বার বার বলেছেন তাঁর আশ্রমের শিক্ষার ক্ষেত্রে। এটি তাঁর আত্মবিশ্বাস, একান্ত করে চাওয়া। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই আনন্দ বয়ে আনে সুর, ছন্দ, রঙ, রেখা, সাহিত্য। এইগুলিই প্রকাশের পূর্ণতাকে বহন করে। তাই রবীন্দ্রচিন্তনে, শিক্ষাদর্শনে, শিক্ষা ব্যবস্থায় সংগীত ও শিল্পের সহাবস্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ, কাঙ্খিত। এগুলিকে রবীন্দ্রনাথ পাঠ্যসূচির অন্তর্গত (curricular) হিসেবেই দেখেছেন। শুধুমাত্র বিজ্ঞানমনস্ক বা বিজ্ঞানসর্বস্ব না হয়ে, তার মধ্যে সংগীত ও চারুকলার রসকে, অনির্বচনীয়তাকে উপলব্ধি করতে পারলে সেই শিক্ষার প্রকাশে আনন্দ ও মুক্তির স্বাদ পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ যখন এই শিক্ষা পদ্ধতি চালু করেন শান্তিনিকেতনে, তখন ভারতে আর কোথাও এই ধরনের বিদ্যানিকেতন স্থাপিত হয়নি, যেখানে শৈশব থেকে শিশুদের সাবলম্বী হতে শেখানো হয় এবং প্রকৃতির মুক্ত পরিবেশে সংগীত, নৃত্য ও অভিনয়কে প্রতিদিনের শিক্ষার একটি বিশেষ অঙ্গ, বিষয়ে হিসাবে স্থান দেওয়া হয় সম্মানের সঙ্গে, সম্ভ্রমের সঙ্গে, শুচিতার সঙ্গে, পবিত্রতার সঙ্গে।

সংগীত এবং ললিতকলাকে শিক্ষাব্যবস্থায় আবশ্যিক করা যে কতটা প্রয়োজন, প্রতিদিনের পঠন-পাঠনের সঙ্গে একে সাবলীলভাবে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেলানো যে বিশেষ প্রয়োজন; যা থেকে শিশু মন পরিপূর্ণ রসদ গ্রহণ করতে পারে — এটিই ছিল রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা, সংগীত চিন্তার বিশেষ দিক। বর্তমানে সংগীত নিয়ে, নাটক নিয়ে, চারুকলা নিয়ে শিক্ষার্থীরা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে, গবেষণা করছেন। রবীন্দ্র চিন্তায় ও মননে সেই দিনের সেই শিক্ষা চিন্তা আজ শিক্ষাব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। এ আমাদের কাছে গৌরবের। পরিপূর্ণ শিক্ষায় নানা প্রকার কলার, বিশেষ করে সংগীতের স্থান যে উচ্চে থাকা উচিত, সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ আদ্যন্ত আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। তাই একথাও জোর গলায় বলেছিলেন যে, ‘‘সংগীত এবং ললিতকলাই যে জাতীয় আত্মবিকাশের প্রকৃষ্ট উপায় এ কথার উল্লেখ করাই বাহুল্য। যে জাত এ দুটি বিদ্যা থেকে বঞ্চিত তারা চিরমৌন থেকে যায়।’’

গ্রন্থপঞ্জি:

- শান্তিনিকেতন ভাষণমালা: ‘‘চিরনবীনতা’’
- ছিন্নপত্রাবলী
- ‘‘তথ্য ও সত্য’’ (রবীন্দ্র রচনাবলী-৪)
- ‘‘আমাদের সংগীত’’ (সঙ্গীত চিন্তা)
- ‘‘শিক্ষার হেরফের’’(রবীন্দ্র রচনাবলী-১২)

—

© Santiniketan Sahityapath